BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY
RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)
(Open Access Peer-Reviewed International Journal)
DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03100021

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 10| October 2025| e-ISSN: 2584-1890

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-উত্তর সমকালীন সংকটও মধ্যবিত্ত মননের প্রতিফলন

Swagata Biswas Mondal

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University, Ranchi

Abstract:

রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পে মূলত স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সমকালীন সংকট এবং নাগরিক মধ্যবিত্তের মনন ও জীবনযন্ত্রণার প্রতিফলন ঘটেছে। দেশভাগের ফলে সৃষ্ট দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, সংখ্যালঘু নিধন, নারীলুণ্ঠন এবং ধর্ষণের মতো বীভৎস ঘটনা তাঁর গল্পে স্থান পেয়েছে। একইসঙ্গে, মধ্যবিত্তের মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন, আর্থিক সংকট এবং ভোগবাদী চিন্তাধারার প্রতি মোহগ্রস্ততাও তাঁর গল্পের প্রধান উপজীব্য। 'অঙ্গপালি' এবং 'করুণকন্যা' গল্প দু'টি দেশভাগের অগ্নিগর্ভ সময়ে নির্যাতিতা নারীর করুণ পরিণতি ও কঠিন বাস্তবতার চিত্র তুলে ধরে। গল্পগুলিতে নারী নির্যাতনের কলঙ্কজনক ইতিহাস এবং পরিবারের প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে সমাজের বর্বর অন্ধকার তুলে ধরা হয়েছে। লেখকের 'ডাইনিং টেব্‌ল', 'বসবার ঘর', 'ফ্রীজ', 'ড্রেসিং টেব্‌ল' ইত্যাদি গল্পগুলিতে নাগরিক মধ্যবিত্তের অভাব, অনটন থেকে উত্তরণের স্পৃহা এবং ভোগবাদী চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে বদলে যাওয়ার আখ্যান প্রাধান্য পেয়েছে। রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্পগুলি মধ্যবিত্তের টানাপোড়েনের দলিল এবং তাঁর মূল অন্বিষ্ট হল এই শ্রেণীর সীমাবদ্ধতা।

Key Words: *রমাপদ চৌধুরী, ছোটগল্প, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, স্বাধীনতা-উত্তর সমকাল, মধ্যবিত্ত মনন।*

Introduction:

১৯৪৭ সালটা ভারতের মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ কালপর্ব। এই সালে জন্ম নিল স্বাধীন ভারতবর্ষ। ধর্মের ভিত্তিতে জন্ম নিল পাকিস্তান ও ভারত নামক দু'টি ভিন্নরাষ্ট্র। দেশ দ্বিখণ্ডিত হলেও সমস্যা মিটল না। দেখা দিল দাঙ্গা, সংখ্যালঘু নিধন, নারীলুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ লুঠ। দাঙ্গার বীভৎসতা এতটাই তীব্র যে, মানুষ ঘর ছাড়তে বাধ্য হল, পূর্বদিকের মানুষ পশ্চিমে, পশ্চিমদিকের মানুষ পূর্বদিকে পালাতে শুরু করল। দেখা দিল উদ্বাস্তু সমস্যা। হাজার হাজার মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ল, নিজের দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যেতে লাগল, দেখা দিল এক জটিল সমস্যা। সেই উত্তপ্ত অগ্নিগর্ভ দেশে সবথেকে ক্ষতিগ্রস্ত হল নারীরা। যেমন আমরা দেখেছি জ্যোতির্ময়ীদেবীর গল্পে, প্রফুল্লরায়ের গল্পে, সলিলচৌধুরীর গল্পে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পে, ঠিক এই অনুষঙ্গ ছেড়ে চলে যাননি লেখক, প্রাবন্ধিক, কবি, কথাসাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী। সমকালীন সংকটছাড়াও মধ্যবিত্তের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিও যে দ্বিধাময় -সেকথা বারংবার উঠে এসেছে গল্পগুলির মধ্য দিয়ে। পরিবর্তিত জীবনযাত্রার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার স্রোতে মধ্যবিত্ত কেবলই অপূর্ণতা থেকে পূর্ণতার দিকে যাত্রা করতে চায়। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ হোক বা অর্থনৈতিক জোর দুইই যখন তার সাধ্যের অতীত, তবুও নিরন্তর মধ্যবিত্ত অভিনব জীবনপ্রণালীকে রপ্ত করার চেষ্টায় নিয়োজিত।

Discussion:

রমাপদ চৌধুরীর উল্লেখযোগ্য দু'টি গল্প হল 'অঙ্গপালি' এবং 'করুণকন্যা'। 'অঙ্গপালি' গল্পটি গড়ে উঠেছে একটি মেয়েকে কেন্দ্র করে, সঙ্গে আছে তার পরিবার। মেয়েটির নাম সবিতা। কয়েকজন কামান্ধ লম্পট হিংস্র পশুরূপী মানুষের কামক্ষুধার বলি হয়েছিল সবিতা। গল্পের শুরু হচ্ছে এভাবে-

> "মাস আষ্টেকের একটি ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে ফিরে এলো সবিতা। ফিরে আসতে বাধ্য হলো। একযুগ পরে। হিসেবে হয়তো বেশিদিন নয়, দেড় বছর কি আরো কম সময়। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময় টুকুর মধ্যে ঘটে গেল কতপরিবর্তন।"১

এখন প্রশ্ন হল সন্তান কোথা থেকে এল ? কামান্ধ পুরুষগুলোর অত্যাচারের ফলস্বরূপ ওই সন্তান। সবিতা পুলিশদের কথাশুনে বাড়ি ফিরে আসে ওই সন্তানকে কোলে নিয়ে। কিন্তু সে ফিরে আসতে চায়না। তার কারণ তাকে সমাজ মেনে নেবে না। সে এখন সমাজ-পরিবার সকলের কাছে মৃত। লেখক দেশভাগের প্রতিচ্ছবি গল্পে যেভাবে তুলে আনলেন সেখানে লেখকের কুশীলবের পরিচয় মেলে-

> "কালো আকাশের অন্ধকার চিরে হঠাৎ একদিন আগুন জ্বলে উঠেছিল দিকে দিকে। আর চিৎকার। রক্তপায়ীদের কোলাহল আর অসহায় মানুষের আর্তনাদ ভেসে উঠেছিল আকাশে বাতাসে। মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সবিতার। পশুর মতো চোখে আর প্রেতের মতো শরীর নিয়ে এগিয়ে এসেছিল তারা। সেই ছায়া-কালো-কালো মানুষগুলো। বাইরে শুধু অন্ধকার আর কালির বৃষ্টি, কিন্তু বৃষ্টির রিমঝিম রিমঝিম ছাপিয়ে ভেসে আসছিল ক্রুদ্ধ জনতার মদো রক্তের চিৎকার। ওরা এগিয়ে এল। কারো হাতে মশাল, কেউবা কৃপাণপাণি। তারপর কি যেন ঘটেছিল। ভালো করে মনেও পড়ে না সবিতার। হয়তো বা চেতনা হারিয়ে ফেলেছিল ও। বোবা আর বোকা চোখ চেয়ে অসহায় দৃষ্টি মেলে দেখছিল। রক্ত আর রক্ত।"২

সকল গ্লানি মন থেকে দূর না করেও সে ফিরে আসে বাড়িতে। বাড়িতে ছিল মা, বোন, ভাই। বাবা মারা গেছেন-

> "সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল মা-র শরীরের বেশবাসের দিকে তাকিয়ে। নেই ?বাবা নেই ? দীর্ঘশ্বাস ফেলে পা টিপে টিপে একটু এগিয়ে গেল সবিতা"৩

সবিতা বাড়ি ফিরে দেখল মা তার সন্তানকে কোলে নিয়েছে, বেশ হাসিখুশিতে আছেন। তবুও তার মধ্যে একটা সংকোচবোধ ছিল। মাতার সন্তানকে সামনে থেকে মেনে নিলেও মনে রসেই পুরোনো জড়তা থেকে মুক্ত হতে পারেননি। লেখক তাই বললেন-

> "ভিজে কাপড়ে মা দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর বন্ধু। বকু বললে, এমনি অসুখ তোমার, আবার এত রাতে চান করলে?মা লজ্জিত হয়ে বললে, কি করব বল। সারাটা দিন ছেলেটাকে নিয়েমাখামাখি করলাম।
>
> -করলেই বা। অবোধ্য অভিমান বকুর গলায়।
>
> মা মুখে বললে, কোলে করে মানুষ করছে বলে তো আর আমাদেরছেলে নয় বাপু।"৪

মায়ের চরম বাস্তব নিষ্ঠুর সংলাপেই লেখক গল্পের সমাপ্তি টেনেছেন। এভাবেই একজন নারীর অগ্নিগর্ভকালের সময়ের তীব্র যন্ত্রণার করুণচিত্র বর্ণিত হয়েছে আলোচ্য গল্পে।

'করুণকন্যা'গল্পটিরনামকরণের মধ্যে দিয়ে লেখক যেন একটি আভাস দিয়ে গেছেন। 'অঙ্গপালি' গল্পেসবিতারশেষ করুণপরিণতিটা সেভাবে লক্ষ্য না করলেও সেই পরিণতির ধ্বনি জাগরিত হয়েছে 'করুণকন্যা' গল্পে। গল্পের প্রধান চরিত্র অর্থাৎ যাকে কেন্দ্র করে ঘটনার ঘনঘটা তার নাম হল অরুন্ধতী। এছাড়া আমরা পাবো কয়েকটি পার্শ্ব চরিত্র যেমন- অরুন্ধতীর মা,

সুবিমল, মাধুরী। অরুন্ধতী ও মাধুরীর করুণ চিত্র লেখক এখানে শব্দের বেড়াজালে আবদ্ধ করেছেন। অরুন্ধতী হল দেশভাগের একজন নির্যাতিতা নারী। 'অঙ্গপালি' গল্পের সবিতার মতোই অরুন্ধতীও পুলিশের হেফাজতে একটি অযাচিত, অবৈধসন্তানকে কোলে করে বছর পাঁচেক পর নিজের পরিবারে ফিরে আসে। পরিবারের সকলে তাকে গ্রহণ করে নিলেও পারিপার্শ্বিক সমাজ তাকে গ্রহণ করতে পারেনি। নানাধরনের বিদ্রূপের সম্মুখে তাকে পড়তে হয়েছে এবং তার জন্য তার পরিবারকেও পড়তে হয়েছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ বাস করে, তার মধ্যে থেকে কিছু মানুষ বিদ্রূপের ভাষায় কথোপকথন করছে অরুন্ধতী ও তার মায়ের সাথে-

> "শ্বশুরবাড়ি থেকে মেয়ে এসেছে বুঝি?সরলতম চোখে হয়তো প্রশ্ন করল কেউ। চুপ করে রইলেন অরুন্ধতীর মা। মাথা হেঁট করলেন ম্লান মুখের অস্বস্তি ঢাকবার জন্য। শেষে অনেক চেষ্টায়, চোখের জল চেপে বললেন, দাঙ্গায়হারিয়ে গিয়েছিল।"[৫]

সমাজের নানাধরনের মন্তব্যে ফালফাল হয়ে যাচ্ছিল অরুন্ধতী ও তার মা। শেষপর্যন্ত মা অরুন্ধতীকেবলে যে ওই সন্তানটিকে অনাথ আশ্রমে দিয়ে আসতে কিন্তু অরুন্ধতী রাজি হয় না। মায়ের মনে সন্তানের জায়গা প্রসঙ্গে লেখক তুললেন কয়েকটি শব্দ। অরুন্ধতী তার মাকে বলল-

> "কি বলছ মা?তার চেয়ে বলো না এক আছাড় মেরে শেষ করে দিই ওকে, তোমরা শান্তিতে থাকতে পারবে।"[৬]

-এই কঠিন এক সময়ে তার মা তাকে বলে বিধবার বেশ ধারণ করতে, কিন্তু অরুন্ধতী তার মায়ের এই পরামর্শ মানতে পারে না। ঠিক এরকম পরিস্থিতিতে অরুন্ধতীর সঙ্গে দেখা হয় সুবিমলের। সুবিমলের পরিবারও দেশভাগের অগ্নির মুখে পড়েছিল। তারা আগে থেকে একে অপরকে চিনত, জানত কিন্তু এখন আবার তারা পুনর্মিলিত হল। তারা একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আর এক করুণ কন্যার কাহিনী উঠে আসল তাদের বাক্যালাপের মধ্য দিয়ে। সুবিমলের বোন মাধুরীকেও, অরুন্ধতীর মতো পাশবিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। অরুন্ধতীর মতো মাধুরীও ধর্ষিত, লুণ্ঠিত হয়েছিল। পুলিশের সহায়তায় মাধুরীও বাড়ি ফিরে আসে। পরিবারের অন্যান্য মেয়েদের কথা ভেবে সবকিছুকে লুকিয়ে বিয়ে দেয়। কিন্তু, মাধুরী বিয়ে করতে চায়নি। সে বলল-

> "সারাজীবন ধরে নিজের কলঙ্ক লুকিয়ে রাখতে পারবে না।"[৭]

কিন্তু, শেষ পর্যন্ত পরিবারের কথা ভেবে মাধুরী বিয়ে করে নেয় এবং বিয়ের পর মাধুরী তার স্বামীকে সবকিছু জানিয়ে দেয়। সবকিছু শুনে তার স্বামী তাকে ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। তার কিছুদিন পর মাধুরীও নিরুদ্দেশ হয়ে যায়, হারিয়ে যায় পতিতা পল্লির গোপন চিলেকোঠায়। মাধুরী পুনরায় বাড়ি ফিরে এলে তাকে বাড়িতে ঠাঁই দেওয়া হয় না, পরিবারের অন্য সকলের কথা ভেবে। সুবিমল অরুন্ধতীকে জানায়-মাধু খারাপ হয়ে গেছে। ধর্ষিত, লুণ্ঠিত এবং কোথাও ঠাঁই না পেয়ে নিজের দেহকে ব্যবসার পথে বেছে নেওয়া এই সবকিছুর জন্যই মাধুরীকে দায়ী করা হয়। তার এই পরিণতির জন্যে সে যেন একাই দায়ী, তার সঙ্গে যারা এটা ঘটিয়েছে তাদের যেন কোনো দায়ী নেই। অরুন্ধতীর সুবিমলকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সব স্বপ্ন নিমেষের মধ্যে ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়। সুবিমলকে ঘিরে তার আর কোনো স্বপ্ন নেই। বরঞ্চ বিদ্রুপের হাসি হেসে সে বলে-

> "তুমিই না বলেছিলে সুবিমলদা, মানুষের মনটা সবচেয়ে বড়। তবু তোমরা-সকলেই ভয় পেলে কেন? -মনতো শরীরের বশ অরুণি। শরীর অশুচি হলে কথা শেষ করতে পারল না সুবিমল। আর অরুন্ধতীর মনে হলো, নীতিবাগীশ কোন গ্রাম্য টুলো পণ্ডিতের কথা শুনছে সে। বয়সে, পোশাক-পরিচ্ছেদে, শিক্ষায়- যত পৃথকই হোক, সব মানুষেরবুঝিবা একই মন।"[৮]

মাধুরীর জীবনের সঙ্গে অরুন্ধতী নিজের জীবনের সূত্রগুলি পরপর মেলায়। তার নিজের প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে মাধুরীর উপর। সবকিছু পরিষ্কার হয়ে যায় তার কাছে। অরুন্ধতী ভাবলো যে সুবিমল অরুন্ধতীর সবকিছু জানার পর তার কাছ থেকে ভালোবাসা, সম্মান কিছুই পাবে না। তাকেও মাধুরীর মতোই 'খারাপ মেয়ে' এই নামে সম্বোধন করবে সুবিমল, যেমনটি করেছিল মাধুরীর প্রতি। অরুন্ধতীর একটি দারুণ দিক লেখক তুলে ধরলেন। অরুন্ধতী তার স্বামীকে ঘৃণা করত, আরেকজন অর্থাৎ সুবিমল সে অরুন্ধতীকেই ঘৃণা করে। যে স্বামীকে অরুন্ধতী ঘৃণা করত সেই স্বামী অরুন্ধতীকে চিঠি পাঠায়-

> "চিঠি নয়, জানিয়েছে আসবে সে, রাত্রির অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে সে আসবে। একটি মাত্র অনুরোধের হাত বাড়িয়ে সে আসবে। নিজের জন্য এই গোপনীয়তা নয়। অরুন্ধতীর সম্মান আহত হবে এই ভয়ে রাত্রির অন্ধকারে আসবে সে। অরুন্ধতীকে ফিরে চায় না সে। জানে অরুন্ধতীকে ফিরে পাবে না। তার আপন সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চায় না সে। জানে, ফিরে পাবে না তাকে অরুন্ধতীর কাছ থেকে। শুধু একটিবারের জন্যে, একটি মুহূর্তের জন্যে গলির মোড়ের গ্যাসপোস্টের তলায় এসে দাঁড়াবে সে, অপেক্ষা করবে। শুধু একবার দৃষ্টির দু-বাহু জড়িয়ে ধরবে তার আপন শিশুসন্তানকে। আর কিছু নয়, আর কোনো উপরোধ প্রার্থনা নয়।"[৯]

সবকিছু শোনার পর অরুন্ধতী হাসলো। শেষমেশ অরুন্ধতী এক সিদ্ধান্ত নিল। স্বামীর চিঠি পেয়ে সে গেল দেখা করতে। লেখক বর্ণনা করলেন যেভাবে-

> "আপন শিশুকে কোলের কাপড়ের আড়ালে নিয়ে পা টিপে বেরিয়ে এলো অরুন্ধতী। মেটে কাদায় অন্ধকার শীর্ণতম পথটুকু পার হয়ে গলির মোড়েগ্যাসপোস্টের দিকে পা বাড়ালো অরুণি।"[১০]

গল্প দু'টির উল্লেখিত তিনজন নারীই জোরপূর্বক বিবাহিত, লাঞ্ছিত ধর্ষিত হয়েছে। লেখকতাদের করুণ পরিণতির সঙ্গে কঠিন বাস্তবতা তাঁর লেখনীর মাধ্যমে পাঠক সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন। গল্প দু'টির মধ্যে দেশভাগে নির্যাতিত নারীর চিত্র যেরকম আমাদের ভাবনাকে উজ্জীবিত করে, তেমনি দেশভাগের নারীদের উপর অত্যাচারকে দগদগে আগুনের মতো জাগরিত করে। দেশভাগের অগ্নিগর্ভ সময়ে নারীশরীরলোভী লুণ্ঠনকারীদের নারীদের উপর অকথ্য অত্যাচার নিঃসন্দেহে এক কলঙ্কজনক ইতিহাসের অধ্যায় সৃষ্টি করেছে। সেইসঙ্গে পরিবারের নিজের আত্মীয়দের প্রত্যাখ্যান, তাদের ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া, অস্পৃশ্য মনে করা ইত্যাদি আমাদের সমাজের বর্বর অন্ধকারকেই তুলেধরে। উপরোক্ত গল্প দু'টিতে লেখক ভাষার সরলতা দেখিয়েছেন। সেইসঙ্গে উপমা চয়ন লেখকের কলমের ধারকেই নির্দেশ করে। তবে এখনও পর্যন্ত এই অত্যাচার আমাদের সমাজ তথা জীবনে প্রযুক্ত আছে।

মধ্যবিত্তের চরম সংকটকালে দাঁড়িয়ে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা বিধ্বস্ত সমাজজীবনকে। রাষ্ট্রীয় বিপর্যয়ের সময়পর্বে বাঙালি মধ্যবিত্তের মধ্যে দেখা যায় মূল্যবোধের অবক্ষয়, নৈতিক অধঃপতন, আর্থিক সংকট। সমকালীন জীবনের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন মধ্যবিত্তের মানসলোকে ক্রমাগত ঘটে চলেছে পরিবর্তন। রমাপদ চৌধুরীর এই গল্পগুলিতে আমরা নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনপ্রবাহের ছবি খুঁজে পাই যে জীবন ভোগবাদের প্রতি মোহগ্রস্ততার। নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবনযন্ত্রণার গ্রন্থিমোচন করেছেন লেখক।

'ডাইনিং টেব্‌ল' গল্পের কাহিনীতে দেখা যায় মামাবাড়ি থেকে পড়াশোনা করা বুড়ি নামক চরিত্রটির মাস দুই আগে লেখা একটি প্রবন্ধের জন্য ত্রিশ টাকার একটি মানি অর্ডার এসেছে। জীবনের প্রথম রোজগারে উচ্ছ্বসিত হয়ে বুড়ি সিদ্ধান্ত নেয় সে গ্র্যান্ড ফিষ্ট দেবে। এই ফিষ্টকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় মূল সমস্যার সূত্রপাত। বুড়ির ছোটমামাদের বাড়িতে ডাইনিং টেব্‌ল নেই বলে তারা কাওকে নিমন্ত্রণ করতে ইতস্তত। কিন্তু সমস্যা শুধু টাকা বা ইচ্ছের নয়, সমস্যা পর্যাপ্ত জায়গার। ফ্ল্যাটের দুখানা ঘর

আর একফালি বারান্দায় নানা আসবাব রেখে পা ফেলার জায়গা নেই। তবুও শেষ অব্দি অফিসের এক বছরের ইনক্রিমেন্টের টাকায় কেনা হয় ডাইনিং টেব্‌ল-

> "চকচকে কালো মার্বেল নয়, কাঠেরই, তবে ডিজাইনটা খুব সুন্দর। প্লাস্টিকের বেত-বোনা চেয়ারগুলো আরো সুন্দর।"১১

বারান্দার কোণে জায়গাও হয়ে যায়। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল ডাইনিং টেব্‌ল কেনার আনন্দ ততই ফিকে হতে লাগল। কখনো দেখা গেল অনভ্যাসের ফলপ্রসূ অরুণার সুক্তোর বাটি উলটে যায়, কখনো জ্যাঠামশাইকে খেতে বসে হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয়। এহেন পরিস্থিতিতে সকলের হাসি ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে লাগল-

> "হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম বাইরের লোক কাছে আসা তো দূরের কথা, আমরাই পরস্পরের থেকে দূরে সরে গেছি। খাবার টেবিলের একপ্রান্তে আমি, আরেক প্রান্তে অরুণা। খাওয়া যেন শুধুই খাওয়া। হাতা আর চামচের ঠুংঠাৎ কিংবা জলের গ্লাস নামানোর ঠক্ শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দও হয় না।"১২

শখ করে কেনা ডাইনিং টেব্‌ল মধ্যবিত্ত এই পরিবারকে কোনো উপরি আনন্দ দিতে পারেনি, পরিবর্তে দিয়েছে অস্বস্তি। স্বল্প আয়ের চাকুরিজীবী তথাকথিত মধ্যবিত্ত কীভাবে আধুনিক জীবনযাপনের ছন্দে পা মিলিয়ে চলতে গিয়ে ধীরে ধীরে বিপর্যস্ত হয়েছে তারই নির্যাস ঘনীভূত হয়েছে গল্পমধ্যে। পাশাপাশি জড়বস্তুও যে গল্পের কেন্দ্রীয় বিষয় হতে পারে সুকৌশলে লেখক তার পরিচয়ও দিয়ে গেলেন।

'বসবার ঘর' গল্পে দেখা যায় মধ্যবিত্ত মানুষ কীভাবে মেকি বস্তুর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে মূল্যবোধের জলাঞ্জলি দিয়ে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। গল্পকথক এবং তার স্ত্রী রেখা যে বাড়িতে ভাড়া থাকে সেখানে কোনো বসবার ঘর নেই। তাই বন্ধু, আত্মীয়স্বজন কেউ এলে তারা বিরক্ত হয়। মালপত্রে ঠাসা এই নোংরা ঘরে কাউকে এনে বসানো যায়। তাদের বসবার ঘর নিয়ে স্বপ্ন ছিল-

> "পরাশর রোডের সেই বাড়িটা যেন চোখে লেগে আছে। থালার মতো বড় একটা ঘষা কাঁচের শেড, আলোটা ঠিক সাদা মেঘ-ঢাকা জ্যোৎস্নার মতো। মেঝেতে কি নরম কার্পেট, আর সোফা সেট! কি নরম গদি, কি চমৎকার ফিকেরঙের ঢাকনি। বহু দিন অবধি অমনি একটা ড্রয়িং রুম আমার স্বপ্ন ছিলো।"১৩

এভাবেই বসবার ঘরের অভাবে সকলের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ঠিক সে মুহূর্তে তাদের সঙ্গে পরিচয় ঘটে পুরনো বন্ধু অলক এবং তার স্ত্রী উমার। অলক একদিন তার স্ত্রীকে নিয়ে কথকের বাড়ি উপস্থিত হলে কথক এবং রেখা তীব্র অস্বস্তিতে পড়ে যায়। অস্বস্তি এবং বসবার ঘরের অভাবে তারা প্রাণভরে আলাপ পর্যন্ত জমাতে পারে না। অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বের পরেও আড্ডা এবং আলাপের অভাবে অলকরা চলে যাওয়ার পর খানিকটা অনুশোচনা থেকে কথকেরা সিদ্ধান্ত নেয় তারাও অলকের বাড়ি যাবে। কিন্তু ঠিকানা খুঁজে অলকের বাড়ি আবিষ্কার করতেই শ্যাওলাধরা মান্ধাতার আমলের জীর্ণ বাড়ি দেখে প্রথমেই বিষম খেতে হয়-

> "উঁচুনিচু ভিজে ইটের উঠোন ডিঙিয়ে একেবারে শোবার ঘরে নিয়ে গেল উমা। কিংবা ঐ একটাই হয়তো।"১৪

কিন্তু কি অমায়িক ব্যবহার অলক-উমার। রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতে বসে লুচি ভাজতে ভাজতে উমার সঙ্গে হাসি, গল্পে মশগুল হয়ে ওঠে রেখাও। বহুদিন পর তাদের হাসতে দেখা গেল। শত অভাব অনটনের মাঝেও আন্তরিকতার এরূপ চিত্র আমাদের কাছে নতুন দ্বার উদঘাটন করে। কথক এবং রেখা শত চেষ্টা করেও অতিথির প্রকৃত অভ্যর্থনা জানাতে পারেনি। বরং আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিল বসবার ঘরের অভাবে। কিন্তু অলক এবং উমা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি অভাবের রাজ্যে বাস করেও হৃদয়ের উদারতায়, আন্তরিকতায় রেখাদের ছাড়িয়ে গেছে। নাগরিক আত্মকেন্দ্রিকতায় বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণী কতখানি বিভ্রান্ত হয়ে

পড়েছে তার চিত্র রয়েছে এ গল্পে। মধ্যবিত্ত আত্মকেন্দ্রিকতায় নিজেকে খোলসের মধ্যে গোপন করে যে অনাবিল প্রশান্তি লাভ করে তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ গল্পটি।

‘ফ্রীজ’গল্পের কথক একজন সাধারণ অফিসকর্মী। মাইনের প্রায় অর্ধেক টাকা যার চারতলার ছোট্ট ফ্ল্যাটের ভাড়া দিতেই শেষ হয়ে যায়। বাকি টাকা সন্তানের স্কুল খরচ, ইলেকট্রিক বিল, ঝি, ডাক্তার, ওষুধ, বাজারখরচ ইত্যাদিতে লেগে যায়। অফিসের দীর্ঘদিন ধরে বোনাস নিয়ে বচসা শেষে নগদ ন’শো টাকা হঠাৎ প্রাপ্তি ঘটলে কথকের স্ত্রী নীলিমা তার বহুদিনের শখের ফ্রিজ কিনে আনার প্রস্তাব করেন। যদিও তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় অনেক জিনিসের অভাব, যথা- স্টেনলেস স্টিলের এক সেট বাসন, পড়ার টেবিল। তথাপি শেষপর্যন্ত ছ’শো টাকা নগদ এবং বাকি টাকা কিস্তিতে দিয়ে ফ্রিজ কেনা হয়। প্রথম প্রথম বেশ খানিকটা আনন্দ বোধ হলেও পরে দেখা যায় ফ্রিজ ইলেকট্রিক বিল এবং বাজারখরচের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে বিধবা মেজদিদি বাড়ি এসে মেয়ের বিয়ের জন্য অসহায়ভাবে দুশো, পাঁচশো টাকা চাইলেও সেই টাকা দিতে অপারগ কথক ঋণের কিস্তির দায়ে। সেই বিবেকদংশনের বশেই মাঝরাতে ঘুম ভেঙে পূর্ণিমার চাঁদের আলোয় সাদা ফ্রিজটাকেই ধুতিপাড় সাদা ধবধবে শাড়ি পরা মেজদির মতো মনে হয়। কীভাবে বিদেশি আদব কায়দা মধ্যবিত্তের স্বাভাবিক জীবনছন্দে একটু একটু করে মিশে যাচ্ছে তার বর্ণনা রয়েছে গল্পে-

> “ওর মুখে ফ্রীজ শুনে তেমনি হাসি পেলো। ভালোও লাগলো। আমরা তো সাহেব হতে পারলাম না। না ছিল সঙ্গতি, না বাসনা। কি ছাই স্বাধীনতা, স্বদেশিয়ানা, ঐতিহ্যবাজে বুলি সব। বিশ্বাস করে পস্তাতে হলো। কায়দা করে ইংরেজী বকুনি কিছুটা যদি শিখতাম, গ্যাবার্ডিনের স্যুট অবশ্য পরি, কিন্তু হাঁটাচলার কায়দা? যে যাই বলুক, কুটকুটকে মিশনারী ইস্কুলে দিয়ে ভালোই করেছি। জীবনে উন্নতি করতে পারবে। দিশী ইস্কুলগুলো।”[১৫]

মধ্যবিত্ত কীভাবে তার সাধারণ জীবনধারাকে বদলে বিদেশিয়ানার ছাঁচে নিজেকে গড়ে নিচ্ছে, কীভাবে সামাজিক রীতিনীতি, শিক্ষা ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে স্বদেশি ঐতিহ্যকে অচিরেই ত্যাগ করে মধ্যবিত্ত মানুষ বিলিতি আদবকায়দা রপ্তের প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হচ্ছে তার প্রতিফলন গল্প জুড়ে বিরাজমান।

‘ড্রেসিং টেব্‌ল’ গল্পে দেখতে পাই একটি ছোট্ট মেয়ে কীভাবে কৈশোর বয়স থেকে একটিমাত্র শখের আসবাবের স্বপ্ন দেখে, একটি ছোট ড্রেসিং টেব্‌ল। স্কুলে কিংবা ঘুরতে যাওয়ার সময় তাকে কেমন মানিয়েছে জানতে হত সকলের মুখে শুনে। তাদের ঘরে বড় আয়নাও ছিল না। বন্ধুর বিয়েতে প্রথম যখন সে ড্রেসিং টেব্‌ল দেখে তার সে মুহূর্তের অনুভূতির প্রকাশ রয়েছে-

> “রাণীর বিয়েতে গিয়ে আমি প্রথম ড্রেসিং টেব্‌ল দেখলাম। তার আগে শুধু সিনেমার ছবিতে দেখেছি। আমি বারবার ড্রেসিং টেলের সামনে দিয়ে ঘুরে আসছিলাম, আড়চোখে আড়চোখে নিজেকে দেখছিলাম। ঠিক মীনাপিসীদের বাড়িতে গেলে যেভাবে আলমারির আয়নায় নিজেকে দেখতাম তেমনিভাবে।”[১৬]

বিয়ে ঠিক হলেও সে তার বাবার কাছে এই একটি দাবি করেছিল, তাকে একটি ড্রেসিং টেব্‌ল দিতে হবে। কিন্তু, সাধ্য না থাকায় তার সাধের ড্রেসিং টেব্‌ল কেনা সম্ভব নয় জেনে সে আর বিয়েতে কোনো উৎসাহ খুঁজে পায় না। কেবলই মনে হতে থাকে-

> “আমি সেই কোন ছোটবেলা থেকে ভেবে রেখেছি বিয়ের সময় একটা ড্রেসিং টেব্‌ল দিতে বলবো বাবাকে। আমার কত দিনের ইচ্ছে অমনি গদি মোড়া টুলে বসে আয়নার সামনে সাজবো, টিপ, লিপস্টিক, স্নো, ক্রিম সব টুকিটাকি সাজানো থাকবে সেখানে, ঘরময় খুঁজে বেড়াতে হবে না।”[১৭]

ড্রেসিং টেব্‌লের ধারণা তার কাছে শুধুমাত্র দর্পণমাত্র নয়, যেখানে নিজেকে প্রতিদিন দেখতে পেলেই সন্তুষ্ট হবে। কীভাবে প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠে গিয়ে ড্রেসিং টেব্‌ল তার কাছে নিছক বিলাসিতার সামগ্রী হয়ে উঠেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন শ্বশুরগৃহে আয়না থাকার পরেও সে ড্রেসিং টেব্‌ল সম্পর্কে তার ধারণার কথা ব্যক্ত করেছে-

> "বেশ ভালো ডিজাইনের বেশ বড় আয়না দেওয়া টেবিল না হলে তো আর ড্রেসিং টেব্‌ল বলে না। ওদের যেটা ছিল সেটাকে কি যে বলবো ভেবে পাই না। একটা চারকোনা উঁচু টেবিলের ওপর একটা মাঝারি সাইজের আয়না বসানো।"১৮

তারপর সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে সংসারের নিত্য খাটনি অন্যদিকে সংসারখরচ নিয়ে টানাটানির কারণে দেখা যায় তার চেহারা ক্রমশ হয়ে উঠেছে কুৎসিত। বহু চেষ্টার পর বছরের পর বছর টাকা সঞ্চয় করে যখন ড্রেসিং টেব্‌ল কেনার সামর্থ্য হল তখন দেখা গেল তার যৌবন শেষ হয়ে শরীরের হাড় উঠে গিয়ে তার কঙ্কালসার চেহারা হয়েছে। সাধ্যের অতীত কাঙ্ক্ষিত বস্তুর প্রতি ধাবমান হয়ে জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় কাটিয়ে শেষপর্যন্ত মেয়েটি তার শারীরিক অবস্থার অবনতি সাধন করেছে। ড্রেসিং টেব্ল কেনার জন্য অর্থ সঞ্চয় করলেও হারিয়েছে তার যৌবন, স্বাস্থ্য এবং সর্বোপরি স্বামীর সান্নিধ্য। ভোগবাদী মানসিকতার মর্মান্তিক পরিণতির দৃষ্টান্ত গল্পটি।

Conclusion:

পরিশেষে একথা বলা যায় যে, এই নিত্য সংগ্রাম মধ্যবিত্তের নিজস্ব। এ হল সমস্ত অভাব, অনটনের দৈন্য থেকে উত্তরণের মধ্যবিত্তীয় স্পৃহা। শূন্যতাবোধ থেকেই জন্ম হয় মধ্যবিত্তের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং তার থেকে উত্তরণের একান্ত প্রয়াস। সেদিক থেকে বিচার করলে নিঃসন্দেহে বলা যায় রমাপদ চৌধুরীর এই ছোটগল্পগুলি যেন মধ্যবিত্তের টানাপোড়েনের দলিল। মধ্যবিত্তের সীমাবদ্ধতাই লেখকের মূল অন্বিষ্ট। নাগরিক মধ্যবিত্ত জীবনের অবক্ষয়, নৈতিক পতন এবং মধ্যবিত্তের অন্তর্গত ভাঙনকেই একমাত্র সত্য বলে প্রতিষ্ঠা করেননি লেখক। শহুরে মধ্যবিত্ত জীবনের বেকার সমস্যা কিংবা তাদের পরিবারিক টালমাটাল অবস্থার কথাও প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর এই শ্রেণীর গল্পগুলিতে। মানুষ হয়েছে শূন্য। লেখকের গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনবোধের সেই শূন্যতা বস্তুত সমকালেরই স্বাভাবিক প্রতিফলন। শহরভিত্তিক মধ্যবিত্ত জীবনের নঞর্থক দিকগুলি তিনি স্পষ্টভাবে স্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছেন। লেখকের দৃষ্টি মধ্যবিত্ত সমাজের বিচিত্র টানাপোড়েনের মধ্যে। ভোগবাদী চিন্তাধারার বশবর্তী হয়ে একটু একটু করে বদলে যাওয়ার আখ্যান যেন এই গল্পগুলি।

Reference:

১. চৌধুরী, রমাপদ। (১৯৯৯)। গল্পসমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, পৃষ্ঠা- ১০৮

২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৮-১০৯

৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১০৯

৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১১২

৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮০

৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮১

৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৬

৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৮৭

৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ১৮৮

১০. পূর্বোক্ত

১১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬০২

১২. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬০৩

১৩. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৫৫

১৪. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৫৬

১৫. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৫৭৯

১৬. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬০৫

১৭. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬০৫

১৮. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা- ৬০৬

Citation: **Biswas Mondal. S.,** (2025) "রমাপদ চৌধুরীর ছোটগল্প : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা-উত্তর সমকালীন সংকটও মধ্যবিত্ত মননের প্রতিফলন", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-10, October-2025.